গণ্ডারের শিং

রবিবারের সকাল। চা জলখাবারের পাট সেরে মেসবাসীরা ইতি উতি বসে আছে গা গতর ছড়িয়ে। কিশোরীদা টাটকা খবরের কাগজখানা মেলে ধরে তার আড়ালে আত্মগোপন করেছেন সাময়িক ভাবে।

গোপাল সেই দিকে একবার তাকিয়ে বিবেককে লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুঁড়লো, "তারপর কাল তোমাদের প্ল্যানচেটের আসরে আত্মারা কি বললেন? রেগান কি এবার ঢেঁসে যাবে? নাকি ইরানগেটের ধাক্কা সামলে ধূলো ঝেড়ে উঠে বসবে আবার?"

বিবেক বললো, "ওসব আলতু-ফালতু কথা জিজ্ঞেস করি না আমরা। ওসব জানতে হলে বি.বি.সি. শোনো, অশরীরি আত্মাদের নিয়ে টানাটানি কেন?"

"তবে প্ল্যানচেটে অন্য কি জরুরী খবর সরবরাহ করেন ওঁরা? এম.আই.ই. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কি থাকবে, এই সব?"

বিবেক তেরিয়া হয়ে বলে, "ক্ষতি কি? অবশ্য এম.আই.ই. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাড়া আরও অন্য ব্যাপারেও শলাপরামর্শ, উপদেশ নির্দেশ পাওয়া যায় প্ল্যানচেট্ থেকে।"

গোপাল বললো, "ফুঃ।"

"কেন 'ফু' কেন? তোমার মানতে ইচ্ছে না হয় মেনো না। তা বলে, তুমি না মানলেই সব 'ফু' হয়ে যাবে?"

কাগজের খসখসানি শুনে উদ্‌গ্রীব হয়ে কিশোরীদার পানে তাকালো সবাই।

খবরের কাগজখানা পরিপাটি করে ভাঁজ করে একপাশে রেখে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে কিশোরীদা বললেন, "রাইট, বিবেক ঠিক বলেছে।

যা আছে তা আছে, আর যা নেই তা নেই। এই থাকা না থাকা কোন ব্যক্তি বিশেষের মানা না মানার উপর নির্ভর করে না, বুঝলে !"

গোপাল বললো, "কিন্তু তাবলে ভূত-প্রেত আত্মা-টাত্মা এগুলো তো আর সত্যি নয় !"

"আলবৎ সত্যি ----," বিবেক খাবার টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললো, "একশোবার সত্যি, হাজারবার সত্যি।"

গোপাল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো, "অত চেল্লানোর দরকার নেই। শুধু একটা কথার জবাব দাও, ভূত প্রেত কোনদিন সজ্ঞানে স্বচক্ষে দেখেছো তুমি?"

বিবেক আরক্তমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিশোরীদা বরাভয়ের ভঙ্গিতে তাঁর দক্ষিণ পাণি উপরপানে মেলে ধরে বললেন, "শান্ত হও, শোনো। ওই যে বললাম, দেখা না দেখা এমন কিছু বড় কথা নয়। কোন কিছুর অস্তিত্ব কারো দেখার উপর নির্ভর করে না। তুমি দেখোনি বলেই যে জিনিষটা নেই তার কোনও মানে নেই। তেমনি যা দেখলে সেটাই যে ঠিক তাও হলপ করে বলা যায় না সব সময় ----।"

সাত সকালে এই তর্কজালের গুরুপাকে ঘুরপাক না খেয়ে সমরেশ সরাসরি প্রশ্ন করলো, "আপনি ভূত দেখেছেন কিশোরীদা?"

কিশোরীদা সংক্ষেপে বললেন, "ভূত নয়, পেত্নী। পেত্নী মামী। আমাদের অবনী মামার বউ।"

এই পর্যন্ত বলে কিশোরীদা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বিবেক ত্বরায় সিগারেট বাড়িয়ে দিলো।

সমরেশ ফস্ করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিতে পরপর কষে ক'টা টান দিয়ে বললেন, "সাতজন লোক মিলে হাতি দেখতে গেছে। চোখ নেই কারোই। হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে। তারপর দেশে ফিরে সবাইকে হাতির বর্ণনা দিচ্ছে।

'আজব জিনিস ভাই এই হাতি। ঠিক দড়ির মত।'

'আরে না-না, মোটা স্তম্ভ একটা।'

'দূর ! হাতি তো অবিকল কুলোর মত।'

'না ভাই, ইয়া বড় তরোয়াল।'

কারো সঙ্গে কারো মেলে না। হাতি নিয়ে হাতাহাতির উপক্রম ----। এটা আমার গল্পের গৌরচন্দ্রিকা বলতে পারো। এতো গেল দৃষ্টিকোণের ব্যাপার। আবার কখন কোন স্টেজে দেখছো সেটাও দেখতে হবে। যেমন ধরো মানুষ জীবটা চতুষ্পদ, না দ্বিপদ, না ত্রিপদ তা নির্ভর করছে তুমি তাকে শৈশবে দেখছো অথবা যৌবনে, নাকি একেবারে বুড়োহাবড়া অবস্থায়, তার উপর।

"যাক যা বলছিলাম। আমি তখন খুব ছোট। দেশের বাড়িতে থাকি। সেটা আমার মামাবাড়ি। দিদিমা দুই বউকে নিয়ে থাকতেন সেখানে। মামারা - বড়মামা আর অবনীমামা - দু'জনেই বাইরে কাজ করতেন। আসতেন ছুটি ছাটায়। বড়মামা পুজোর ছুটি আর বড়দিন, বছরে এই দু'বার শুধু আসতেন। অবনীমামার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। প্রায় প্রতিমাসেই আসতেন নিদেনপক্ষে দু'তিন দিনের জন্যে। আর তখনি গোল বাধতো। কিন্তু ছোটমামী যে পেত্নী সেটা গোড়াতে কেউ ধরতে পারেনি। কারো মাথাতেই আসেনি কথাটা। তা না হলে রাত বিরেতে ছোটমামীকে চিলেকোঠায় কতবার দেখেছি। ছাদের দরজায় পিঠ দিয়ে এলোচুলে দাঁড়িয়ে আছে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। অন্যরাও দেখেছে তাকে।

"দিদিমা বলতো, 'আহা কিই বা বয়েস। নতুন বিয়ে হয়েছে। কচি মেয়েটা বরের সঙ্গে রাত কাটাতে বড্ড ডরায়।'

দিদিমা হুবহু ওই কথাগুলোই বলেছিল কিনা মনে নেই, তবে ওদের কথাবার্তা থেকে আমার মনে হত ছোটমামী অবনীমামাকে ভীষণ ভয় পায়। অবশ্য ভয় পাওয়ার মতই চেহারা ছিল অবনীমামার। ইয়া লম্বা চওড়া মানুষটা। এক্সাসাইজ করে আর ছোলাগুড় খেয়ে যা মাস্‌ল্‌ করেছিল এক একখানা ! রোজ রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেলে মা আর বড়মামী ছোটমামীর হাত ধরে তাকে শোবার ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসতো। তারপর কখন কোন ফাঁকে মামী সুড়ুৎ করে কেটে পড়তো। অবনীমামা আবার ইদানীং মহিষাসুরের মত ইয়া গালপাট্টা গোঁফ আর জুল্‌পি রাখতে শুরু করেছিল। ছোটমামীর ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হত আমার।

"তবুও সেই রাত্তিরের ব্যাপারটার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। সেদিন অমাবস্যা। রাত দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। কড় - কড় - কড়াৎ করে বাজ পড়ার আওয়াজ। সেই আওয়াজ ছাপিয়ে হঠাৎ এক বিকট আর্তনাদ শোনা গেল। অবনীমামার ঘর থেকে আসছে শব্দটা। সবাই হুড়মুড় করে ছুটলো। ধরাধরি করে তুলে বিছানায় শুইয়ে জল,পাখা, চটি শোঁকানো, ইত্যাকারে অনেক পরে জ্ঞান এলো মামার। চোখ মেলে ইতি উতি চাইছে। ঘরের এক কোণে একগলা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে ছোটমামী। সেদিকে চোখ পড়া মাত্র, 'ওরে বাবারে, খেয়ে ফেল্লেরে' বলে আরেক দফা পতন ও মূর্ছা। আবার সেই দশাসই মানুষটাকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে আর এক দফা জল - পাখা - আর চটির ফরমাস।

"সেইদিনই প্রথম জানা গেল যে ছোটমামী পেত্নী। অবনীমামা বিশদভাবে বললো সব কথা। কড় - কড় - কড়াৎ করে বাজ পড়ছিল। বিদ্যুতের আলোর ঝলমলানি চারিদিকে। অবনীমামা জল খেতে উঠেছিল। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় জানলার বাইরে নজর গেল। তেঁতুল গাছটার তলায় কে যেন দাঁড়িয়ে। ওমা ও কে গা? অবনীমামা স্পষ্ট দেখলো ছোটমামী গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। তাহলে রাতভোর বিছানাতে শুয়েছিল কাকে নিয়ে? অবনীমামা ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে দিলো। আধো অন্ধকারে এক মাথা চুল বালিশে এলিয়ে শুয়ে রয়েছে ছোটমামী। অবনীমামা বিকট এক চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল----।

"অবনীমামা পরদিনই শহরে ফিরে গেল নিজের কর্মস্থলে। এরপর আর বহুদিন দেশের বাড়িতে আসেনি। প্রথমে ঠিক হয়েছিল পেত্নীমামীকে তার বাপের বাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দিদিমা বললো সেটা সময়সাপেক্ষ কারণ পেত্নীমামী বিয়েতে গয়নাগাঁটি বাসনকোশন তৈজসপত্র যা এনেছিল সে সবই ছোট মাসির বিয়েতে যৌতুক সাজিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেত্নী বলে তো আর খালি হাতে ফেরৎ পাঠানো যায় না। পেত্নীমামীর বাবা আবার উকিল মানুষ, দুম করে যদি মামলা ঠুকে বসে! পেত্নীমামী আমাদের দেশের বাড়িতেই রয়ে গেল।

গোড়ার দিকে অবশ্য তাকে একটু এড়িয়ে চলতো সবাই। কিন্তু সে

আর ক'দিন। বড়মামীর কোলে বাচ্চা, কাজকর্ম বিশেষ করে উঠতে পারে না। সর্বক্ষণ খোঁটা দিতো পেত্নীমামীকে।

বলতো, 'পেত্নী হতে হলে কপাল করতে হয়। দু'বেলা বাড়াভাত পাতের গোড়ায় ধরছি। পেত্নীবিবি আমাদের কুটোটিও দুখানা করবেন না। মরে যাই!'

দিদিমা ক্রমে পেত্নীমামীকে দিয়ে এটা ওটা করাতে লাগলেন। এরপর ক্রমশ রান্নাবান্না, কাঁথাসেলাই, ফি বছর বড়মামীর আঁতুর তোলা, বাচ্চাদের নাওয়ানো খাওয়ানো সবকিছুই পেত্নীমামীর ঘাড়ে এসে পড়লো। তবে পেত্নী নামটা আর খণ্ডানো গেল না ----।"

কিশোরীদা বিবেকের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝোলালেন এবং নির্ধারিত ধূমপান-বিরতির পর কাহিনীর খেঁই ধরলেন আবার। "এরপর আমি মোতিহারি চলে যাই। মামাবাড়ির খবর অবশ্য নিয়মিত পেতাম। শুনলাম অবনীমামা চাকরি-বাকরি ছেড়ে পুরোপুরি শরীরচর্চায় লেগে গেছে। বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন কাগজে খবর পড়লাম আমেরিকার এক বিখ্যাত ভূত বিশারদ এদেশে এসেছেন। পেত্নীমামীর ব্যাপারটা গবেষণা করতে। আবার শুনলাম সেই ভূত বিশারদ দেশে ফিরে গিয়েছেন। পেত্নীমামীকে নয়, অবনীমামাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন দেশে।

"এর কিছুদিন পরে জুলপি-গোঁফ ফেলে দিয়ে ন্যাড়া মাথা কৌপীন পরা এক পালোয়ান পুরুষ আমেরিকার রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হলেন। স্বামী উত্তুঙ্গবীর্যের বাণীতে ছেয়ে গেল সারা দেশ। 'মেক্ লাভ্, নট ওয়ার'। বড় বড় পোস্টার, বিজ্ঞাপন, দেয়াল জোড়া গ্রাফিতি।

স্বামিজী বললেন, 'হে পাশ্চাত্য নারীগণ ! তোমরা নারী জীবনের চরম সার্থকতা ভুলিতে বসিয়াছ। নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারিতেছ। এখনও ক্ষান্ত হও। ফিরিয়া আইস। অর্থোপার্জনের দুরূহ পথ ছাড়িয়া পরমার্থার্জন করিয়া সার্থক হও।'

হুজুগের দেশ আমেরিকা। রাতারাতি সাড়া পড়ে গেল। পঞ্চাশ খানা রাজ্য জুড়ে স্বামী উত্তুঙ্গবীর্যকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। পরমার্থের সন্ধানে কাতারে কাতারে মহিলারা ছুটে চললো স্বামীজীর সন্নিধানে।

"এরপর বেশ ক'বছর অবনীমামার খোঁজখবর রাখতে পারিনি। স্বামী উত্তুঙ্গবীর্য হঠাৎ নাকি অদৃশ্য হয়ে যান। কেউ বলে কালপূর্ণ হতে তিনি আতলান্তিকের অতলে তলিয়ে গেছেন, কেউ বলে তাঁর দিব্যদেহ ঊর্ধ্বগামী হয়ে নীলাচলে মিলিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল হতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে অবিরত। আবার দুর্জনে বলে অনেক কালোটাকা আত্মসাৎ করে তিনি রাতারাতি সুইজারল্যাণ্ডে সরে পড়েছেন মার্কিন জেলের ফাটকজাত হবার আগেই।

"বছর তিনেক আগে হঠাৎই একবার কাটোয়া যেতে হল। বড়মামা রিটায়ার করে ওখানেই সেট্‌ল্‌ করেছেন পাকাপাকি ভাবে। শুনলাম অবনীমামাও নাকি সাতঘাটের জল খেয়ে শেষে কাটোয়াতে এসে ভিড়েছেন আবার। আর পেত্নীমামী তো সারাটা জীবন শ্বশুরবাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছে শত অপবাদ সহ্য করে। আদতে আড়ালে যে যাই বলুক পেত্নীমামীকে সবাই মনে মনে বেশ খাতির করতো। দারুণ খাটিয়ে মানুষ ছিল যে। বড়মামীর ওই রাবণের গুষ্টি পেত্নীমামীর হাতেই গড়ে উঠেছে বলতে গেলে।

"দিন পাঁচেক ছিলাম ওখানে। সুঁটকো ঢ্যাঙ্গা কুঁজো মতন লোকটা যে সেই স্বনামধন্য অবনীমামা বড়মামা না বললে বিশ্বাস করতাম না। বড়মামা বললো অবনীমামার নাকি মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে। সব সময় কি সব বিড়বিড় করে। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে খলনুড়ো নিয়ে কি সব গুঁড়ো করে আবার তাই দিয়ে বড়ি বানিয়ে ছাদে রোদ্দুরে শুকোতে দিয়ে আসে সে সব। আমাকে সামনে পেয়ে একদিন পাকড়েছিলেন অবনীমামা।

কষে হাত চেপে ধরে কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, 'গণ্ডারের "র" আর রামছাগলের "রা" - এই দুইই যে এক, সে কথা বললে বিশ্বাস করো না কেন?'

'আজ্ঞে?'

'সময় বুঝে চলতে হয়, বুঝলে? এখন কি আর আগেকার সেই দিনকাল আছে ! সেই ঢালাও জঙ্গল, আর জঙ্গল জুড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় গণ্ডার? শিং ভস্মের শরবৎ, শিং-এর বড়ি ----। সেই একবার মাহালপুরের জমিদার বাড়ি থেকে এক কুচি শিং জোগাড় করে সেবন করেছিলাম ---- ' অবনীমামা চোখ মটকে খিক্‌ খিক্‌ করে হাসলেন, 'সে

যে কি দারুণ মাল সে আর কি বোলবো ! তবে এখন আর সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। এখন থাকার মধ্যে এই রামছাগল। তা ইনিও কম যান না। তবে কিনা গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না। যত্র তত্র চরে বেড়াচ্ছে, কেউ চেয়েও দেখে না। কিন্তু এই ছাগলাদ্য বটিকা খেয়েই গোটা পুরুষ জাতটা তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে একদিন। আমি স্বামী উত্তুঙ্গবীর্য এই ভবিষ্যৎবাণী করে গেলাম। তুমি সাক্ষী রইলে। আমার ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হবার নয়।'

স্বামী উত্তুঙ্গবীর্য ওরফে অবনীমামা চোখ বুঁজে অড়ং বড়ং মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন আর আমি সেই সুযোগে হাত ছাড়িয়ে চম্পট্।

"বড়মামা ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন।

ট্রেন ছাড়ার আগে বললেন, 'বাবা কিশোরী, তোমাদের তো কত জায়গায় যাতায়াত, কত কিছু কানে আসে তোমাদের। তোমার অবনীমামার একটা হিল্লে করে দিও বাবা। ওর মাথাটা কোনরকমে ঠিক করিয়ে দাও। এ যে আর চোখে দেখা যায় না।'

শুনেছিলাম আমেরিকায় নাকি অনেক টাকা কামিয়েছিল অবনীমামা।

সে কথা তুলতে বড়মামা 'শিব শিব' বলে দু'হাতে কান পাকড়ালেন, 'কামিনীকাঞ্চনের মত পাজি জিনিস আর ত্রিভুবনে নেই। কামিনীর দেওয়া কাঞ্চন সে তো সাক্ষাৎ গরল ! মাগীগুলো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়েছিলো বটে কিন্তু অবনীটাকে একেবারে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ছেড়েছে। ছ'মাস সুইজারল্যাণ্ডে শয্যাশায়ী ছিল এক নামকরা নার্সিং হোমে। প্রচুর খরচপত্তর করে কোনমতে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে, কিন্তু আগেকার সেই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য কি আর ফিরে পাওয়া যায় ! সামান্য যৎকিঞ্চিৎ টাকাকড়ি যা উদবৃত্ত ছিল তাইতেই হেসেখেলে চালাতে পারতো, কিন্তু ওই যে মতি গয়লানিকে দু'লাখ টাকা দিতে হল ----।'

'মতি গয়লানিকে? দু'লাখ? কেন?'

'মতি গয়লানি কোর্টে দাঁড়িয়ে বললো ছুটি ছাটায় অবনী যখন বাড়ি আসতো ওই নাকি বউ সেজে ওর ঘরে রাত কাটিয়েছে। ঝাড়া তিনমাস ধরে। বউমা ওকে হাতেপায়ে ধরে রাজি করিয়েছিল এই ব্যবস্থায়। তা নাহ'লে আত্মঘাতী হবে বলেছিল। মতিগয়লানির হাবা ছেলেটা নাকি আসলে অবনীর সন্তান ----।'

"পরিষ্কার মনে পড়লো সে সব। অবনীমামার বউ রাতভোর বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। একদিন বাজ-পড়া রাতে মামা দেখে ফেলে তাকে। তদবধি পেত্নী অপবাদ। এতদিন পরে ব্যাপারটা খোলসা হল।

বড়মামা কেশে গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'এ সব কথা এখানে সকলেই জানে। তবু দেশে গাঁয়ে অত চট করে পুরোনো বিশ্বাস ভাঙতে চায় না। এখনও বউমাকে পেত্নী বলেই মানে অনেকে। অমাবস্যায়, শনিবারে, ভূত চতুর্দশীর দিনে থালা সাজিয়ে "সিধে" দিয়ে যায়। তাবিজ মাদুলি শুদ্ধি করাতে আসে, সে সবের দরুনও বউমা টাকাকড়ি মন্দ পায় না। অবনীর তো কানাকড়ির পুঁজি নেই, বউমার রোজগারেই চালাচ্ছে বলতে গেলে। অবশ্য আমরাও আছি। সহোদর ভাই আর ভাইবউকে তো আর এক কথায় ফেলে দেওয়া যায় না ! শুধু ওর মাথাটা যদি সুস্থ থাকতো ! তুমি বাবা আমার এই কথাটা মনে রেখো। কোথাও খোঁজ খবর পেলে একখানা পোস্টকার্ড ফেলে জানাতে ভুলো না।"